

Is Small Beautiful (E)?

ছোট কি সবসময় সুন্দর হয়?

“আমার বিভিন্ন পদে থাকার সময়ে দু’টি সমস্যা আমাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তায় রাখত। একটি ছিল নির্মাণকাজ সময়ে শেষ না হওয়া; আর দ্বিতীয়টি ছিল সীমিত লোকবল দিয়ে পরিস্থিতি সামলানো। বিশেষ করে ‘অধস্তন অ-শিক্ষক কর্মী’ (Subordinate Non-teaching Staff - SNTS) সংক্রান্ত সমস্যাটি আমাকে খুব ভাবাতো। এই দু’টি সমস্যা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তবে প্রথম সমস্যাটি – নির্মাণকাজ ঠিক সময়ে শেষ না হওয়ার ভয় – আমার কার্যকালের প্রথম বছরে যতটা চিলিত করেছিল, দ্বিতীয় সমস্যাটি, অর্থাৎ অ-শিক্ষক কর্মী ব্যবস্থাপনা, সমাধান করতে প্রায় চার বছর সময় লেগে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সমস্যাগুলো পুরোপুরি মেটাতে না পারলেও, এক অর্থে আমরা বিজয়ীই হয়েছিলাম,” আইআইএমকে-এর (IIMK) এক প্রাক্তন অধিকর্তা প্রতিষ্ঠানটিতে তাঁর পাঁচ বছরের কার্যকালের স্মৃতিচারণ করার সময় এই কথাগুলি বলেন। নির্মাণকাজ সময়সূচী অনুযায়ী শেষ করার ক্ষেত্রে তাঁকে যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, সেগুলি ‘ISB (A-D)’ নামক কেস স্টাডিতে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই কেস স্টাডিটিতে অ-শিক্ষক কর্মীদের (Subordinate Non-teaching Staff - SNTS) ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জটি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Problems of Non-teaching Staff

অ-শিক্ষক কর্মীদের সমস্যা

২০০৪ সালের মার্চ মাসের কথা। যোগদানের এক মাসের মধ্যেই এক অধিকর্তাকে অ-শিক্ষক কর্মী (SNTS) সমিতির কাছ থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার উপর একটি লিখিত দাবি পেশ করা হয়। এই দাবিগুলোর মধ্যে ছিল বেতন পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির অসঙ্গতি এবং তার সঙ্গে জড়িত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমস্যা দূরীকরণ, কর্মীদের সন্তানদের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগের দাবি এবং ছয় বছরের চাকরি পূর্ণ হওয়ার পর পদোন্নতি ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ই ছিল অত্যন্ত জটিল; আর এই সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়, সে সম্পর্কে নতুন অধিকর্তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা (Chief Administrative Officer) তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি অ-শিক্ষক কর্মচারীদের সমিতির পদাধিকারীদের সাথে কোনো প্রকার আলোচনায় না বসেন বা তাঁদের দাবি-দাওয়াকে গুরুত্ব না দেন। অধিকর্তা সেই পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ওই সমিতিটি কোনো স্বীকৃত শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল না এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭ জন। তবে, তিনি ওই কর্মীদের উপেক্ষা করার পরামর্শটি গ্রহণ করেননি। এর পরিবর্তে, তিনি তাঁর নিজের কার্যালয়ে সব অ-শিক্ষক কর্মীর সাথে দেখা করার প্রস্তাব দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকলের সাথে একটি খোলামনে তাদের সমস্যাগুলো শোনা ও আলোচনা করা যাতে যোগাযোগের কোনোরকম ফাঁক না থাকে। তাদের সমস্যাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে না শুনলে এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিতে পারত। SNTS-এর অধিকাংশ সদস্যই ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে আইআইএমকে-তে (IIMK) যোগদান করেছিলেন। যেহেতু আইআইএমকে-র ‘ব্যয় ও অর্থসংস্থান

কমিটি বা EFC-এর অনুমোদন ২০০৩ সালের শুরুতে পাওয়া গিয়েছিল, তাই কর্মীদের নিয়মিত চাকরির স্বায়ীকরণ (confirmation) করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ২০০৩ সাল নাগাদ মোট ৩০ জন অ-শিক্ষক কর্মচারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন সাধারণ কর্মী এবং ১০ জন কর্মকর্তা। যদিও ২০০৩ সালের শুরুর দিকে EFC-এর অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল, তবুও অ-শিক্ষক কর্মীদের মাত্র ১৪টি পদ মঞ্জুর করা হয়েছিল, 'স্নাতকোত্তর কর্মসূচি' (PGP)-এর শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে - যেখানে প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১.১ জন অ-শিক্ষক কর্মী থাকার অনুপাত ঠিক করা হয়েছিল। যেহেতু ওই কর্মসূচিতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন, তাই মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৩০ জন। অথচ, সেই সময় আইআইএমকে-এর নথিপত্রে (on rolls) অ-শিক্ষক কর্মী সংখ্যা ছিল ঠিক তার দ্বিগুণ।

তাই আইআইএমকে (IIMK) তাদের শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ১২০ করতে বাধ্য হয়েছিল; যদিও এই বাড়তি শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম ও ছাত্রাবাসগুলো তখনো তৈরি ছিল না। এই বিষয় 'কেস সেন্টার' (Case Centre)-এ নিবন্ধিত (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: 314-194-1; লিঙ্ক দেখুন: <http://www.thecasecentre.org/educators/products/view?id=122274>)।

২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে, অতিরিক্ত অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কেবল ২০০৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই সব কর্মীদের চাকরি স্বায়ী (confirmation) করা হয়েছিল, যা ছিল নতুন অধিকর্তা কাজে যোগ দেওয়ার মাত্র পনেরো দিন আগে। ততদিনে অ-শিক্ষক কর্মীদের প্রায় সকলেই ৬ থেকে ৭ বছরের চাকরিজীবন পার করে ফেলেছিলেন। তাঁদের অনেকেই অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠান (যেখানে তাঁদের প্রাক্তন সহকর্মীদের কেউ কেউ ততদিনে অন্তত একটি পদোন্নতি পেয়ে গিয়েছিলেন) থেকে আইআইএমকে-তে এসেছিলেন। উল্লেখ্য যে, ওই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ-শিক্ষক কর্মীদের সংখ্যা ছিল আইআইএমকে-এর তুলনায় ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি। ফলে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের (MHRD) অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে, যেখানে PGP (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ছিল প্রায় একই রকম, সেখানকার অ-শিক্ষক কর্মীদের তুলনায় আইআইএমকে-এর কর্মীদের প্রায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশি কাজের চাপ নিতে হতো। এই অবস্থায়, তাঁদের চাকরি স্বায়ী বা নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁরা যে পদোন্নতির দাবি জানাবেন, তা মোটেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। সমস্যাটি আরও বেড়ে গিয়েছিল এই কারণে যে, তাঁদের সকলের বেতন কাঠামো (pay scales) ছিল মাত্র দুটি স্তরে সীমাবদ্ধ; যার মধ্যে ১৩ জন কর্মীই ছিলেন ৫০০০-৮০০০ টাকার বেতন স্কেলে (দেখুন: সংযোজনী ১)। কোনো অবস্থাতেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ওই ১৩ জন কর্মীর সকলকেই পদোন্নতি দেওয়ার অনুমতি দিত না, কারণ তা হলে আইআইএমকে-এর মোট ৩০ জন অ-শিক্ষক কর্মীর মধ্যে ২৩ জনই পদোন্নতি পেয়ে 'কর্মকর্তা' (officer) হতেন।

নতুন অধিকর্তার পক্ষে কোনো সন্তোষজনক পদক্ষেপ ছাড়া অ-শিক্ষক কর্মীদের মধ্যে এই পর্যায়ের কর্মদক্ষতা বজায় রাখা মোটেও সহজ ছিল না। শুরুতে তিনি খুব শঙ্কায় ছিলেন যে, হয়তো কোনো একদিন অ-শিক্ষক কর্মীদের আন্দোলনে আইআইএমকে-এর শিক্ষাকার্যক্রম পুরোপুরি অচল হয়ে পড়বে; কারণ প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি রাজ্যে অবস্থিত ছিল, যেখানে ঘনঘন ধর্মঘট ও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যেত। একটি ছাড়া, প্রতিটি শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যক্রম মাত্র একজন অ-শিক্ষক কর্মী দেখাশোনা করতেন। তাই যদি এরা কেউ ধর্মঘটে যেতেন, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ পুরোটাই বন্ধ হয়ে যেত; আর যদি তাঁরা সবাই মিলে ধর্মঘটে নামতেন, তবে আইআইএমকে-এর শিক্ষাকার্যক্রম

সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ার ভয় ছিল।

Agitation by Non-teaching Staff

অ-শিক্ষক কর্মীদের আন্দোলন

এর পরের তিন মাস ধরে অ-শিক্ষক কর্মীরা হাতেগোনা কয়েকটি স্মারকলিপি ও মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ছাড়া আর বড় ধরনের আন্দোলন করে নি। জুলাই মাসের শেষের দিকে, নিজের জন্মশহর থেকে (যা আইআইএমকে থেকে ২৬০০ কিলোমিটার দূরে ছিল) ফিরে আসার পথে, আইআইএমকে-এর অধিকর্তা স্নাতকোত্তর কর্মসূচির (PGP) চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ইমেইল পান। সেই ইমেইলে জানানো হয়েছিল যে, আইআইএমকে-এর অ-শিক্ষক কর্মীরা স্নাতকোত্তর পরীক্ষা বর্জনের হুমকি দিচ্ছেন। ফিরে আসার পরেই তিনি সকল কর্মীকে নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করেন। সেই বৈঠক চলাকালীন তাঁর সামনে অ-শিক্ষক কর্মীদের দাবিদাওয়ার একটি বিশাল তালিকা উঠে আসে (যা পরের কয়েক বছর ধরে তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি মূল নির্দেশিকা বা 'চার্টার' হিসেবে কাজ করেছিল)। এই দাবিগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো:

1. অ-শিক্ষক কর্মীদের একটি সুনির্দিষ্ট পদোন্নতি নীতির আওতায় এনে তাদের পদোন্নতি কার্যকর করা।
2. তিনজন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং দুইজন সিনিয়র লাইব্রেরি সহকারীদের বেতন সংক্রান্ত অসঙ্গতি দূর করা।
3. CPF/GPF-সহ পেনশন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
4. কর্মীদের সন্তানদের জন্য আইআইএমকে ক্যাম্পাসের ভিতরেই একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চালু করা।
5. চুক্তিভিত্তিক ও অন্যান্য কর্মীদের আইআইএমকে-এর বাস ব্যবহারের (অফিসে যাতায়াতের জন্য) মাশুল ঠিক করা।

আইআইএমকে-এর অধিকর্তা তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন তাঁদের দাবির তালিকা আর না বাড়ান। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, বিষয়গুলোর সুরাহা করতে তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতক্ষণ না তিনি তাঁদের প্রাপ্য বুমিয়ে দিতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি তাঁর নিজের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করবেন না। তাঁর এই অঙ্গীকারের প্রমাণ দেখানোর জন্য, তিনি ইকোনমি ক্লাস ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণিতে ভ্রমণ করা বন্ধ করলেন, এসি-১ ক্লাস এড়িয়ে চললেন এবং বাড়িতে অতিথি আপ্যায়ন করা বা নিজের প্রাপ্য খরচের অর্থ ফেরত (reimbursement) দাবি করা থেকে বিরত রইলেন, যাতে মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে পারে।

উপরে প্রথম যে তিনটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে, যেগুলোর সমাধান হতে চার বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। অন্যদিকে, চতুর্থ ও পঞ্চম সমস্যাগুলো সংবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও, মাত্র ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যেই সেগুলি সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল।

আইআইএমকে-এর অধিকর্তা ভাবছিলেন, তাঁর পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া ঠিক কতগুলো অমীমাংসিত বিষয় তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দেরি হওয়ার বিষয়টি নিজেই ছিল একটি জটিল সমস্যা (ISB C&D দেখুন)। এর উপর পিজিপি কোর্সের জন্য বছরে মাত্র এক লাখ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছিল, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নেওয়া দেড় লাখ টাকা থেকে এক লাখ পচাত্তর হাজার টাকার তুলনায় অনেক কম ছিল।

অধিকর্তা ঠিক করলেন যে তিনি দ্বিতীয় সমস্যাটির প্রথমে মোকাবিলা করবেন। এই বিষয়ে এর আগের চিঠিপত্রগুলো পড়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে লেখা চিঠিগুলোতে উপরে দেওয়া ২ ও ৩ নম্বর সমস্যা ছাড়াও আরও কিছু বিষয় ছিল, যেমন: ‘মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ ও ‘গ্রন্থাগারিক’-এর পদমর্যাদা উন্নীতকরণ এবং ‘ম্যানেজার, কম্পিউটার সেন্টার’ পদের পরিবর্তন করে ‘সিস্টেমস ম্যানেজার’ করা। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে একটি মাত্র চিঠিতে সব সমস্যার বিষয় একসঙ্গে না লিখে, বিষয়গুলোকে আলাদা আলাদাভাবে জানাবেন। প্রথম চিঠিতে তিনি ‘ম্যানেজার, কম্পিউটার সেন্টার’-এর পদবি পরিবর্তনের অনুরোধ জানালেন, যা কয়েক মাসের মধ্যেই মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করল।

পরবর্তী চিঠিতে তিনি বেতন নির্ধারণে অসঙ্গতিগুলোর কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন পুনর্নির্ধারণের মধ্য দিয়ে; তবে সিনিয়র লাইব্রেরি সহকারীদের বেতন পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে রাজি হয়নি। তারা বলে যে, পঞ্চম বেতন কমিশনের অধীনে বেতন নির্ধারণে কোনো অসঙ্গতি নেই।

তৃতীয় সমস্যাটি ছিল আরও জটিল। ভারত সরকার ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ‘জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (GPF)-সহ পেনশন প্রকল্প’ বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যেমন আইআইএমকে-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়মটি প্রযোজ্য ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের সব কর্মীকে তখন ‘কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (CPF)’ অথবা ‘এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (EPF)’-এর আওতাভুক্ত করার কথা ছিল। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের EFC (ব্যয় ও অর্থসংক্রান্ত কমিটি)-এর অনুমোদন ২০০৩ সালের শুরুর দিকেই পাওয়া গিয়েছিল, তাই শিক্ষক ও অ-শিক্ষক, উভয় পদেরই অনুমোদন দেওয়া হয় ২০০৩ সালের মার্চ ও অক্টোবর মাসে। ফলে, যেসব কর্মী তাদের পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তার সম্মতি নিয়ে বদলির মাধ্যমে না এসে সরাসরি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, তারা জিপিএফ-GPF সহ পেনশন প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি; কারণ তখনো অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়নি এবং অধিকাংশ কর্মীই স্বেচ্ছায় CPF প্রকল্প বেছে নিয়েছিলেন। ২০০২-০৩ সাল থেকে সুদের হার কমতে শুরু করার পর থেকেই তারা GPF-সহ পেনশন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি জানাতে শুরু করেন। উদ্বেগের আরেকটি বড় কারণ ছিল যে, CPF সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক নোটিস তখনো জারি হয়নি। কর্মীদের মধ্যে এই আশঙ্কা কাজ করছিল যে, যদিও তারা CPF-এ জমাকৃত অর্থের ওপর করে ছাড় পাচ্ছিলেন, তবুও আয়কর কর্তৃপক্ষ যদি কোনো কারিগরি বা পদ্ধতিগত ত্রুটির (যেমন: সরকারি নোটিস না

থাকা) অজুহাতে সেই করে ছাড় দিতে অস্বীকার করে, তবে তাদের বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হবে।

আইআইএমকে-এর অধিকর্তা কর্মীদের কাছে জানতে চান যে, তারা আসলে কোন প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে চান – সিপিএফ CPF না কি ইপিএফ EPF। যদিও ইপিএফ প্রকল্পটি আর্থিকভাবে অধিক লাভজনক ছিল (কারণ এতে সিপিএফ-এর ১০ শতাংশের তুলনায় নিয়োগকর্তার পক্ষ থেকে ১২ শতাংশ অর্থ জমা দেওয়ার বিধান ছিল), তবুও এই প্রকল্পে ঋণ বা টাকা তোলার আবেদনগুলো মেটাতে অনেক বেশি সময় লাগত। এটি কর্মীদের জন্য নানাবিধ ভোগান্তির সৃষ্টি করতে পারত; কারণ ইপিএফ কমিশনার চাইলে প্রত্যেক কর্মীর কাছে, সিপিএফ প্রকল্পে যোগদানের প্রথম দিন থেকে শুরু করে, অতিরিক্ত দুই শতাংশ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারতেন। তাছাড়া, অনেক কর্মীই বিভিন্ন প্রয়োজনে ইতিমধ্যে এই তহবিল থেকে ঋণ নিয়েছিলেন কিংবা টাকা তুলেছিলেন। ইপিএফ দপ্তর কীভাবে সেই বিষয়গুলোর সুরাহা করবে, তা নিয়ে অনেকেই গভীর দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

তাই, কর্মচারীরা ইপিএফ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে সিপিএফ প্রকল্পটি বেছে নেওয়ার দিকেই ঝুঁকলেন (যদিও ইপিএফ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা অধিকর্তার জন্য কম ব্যামেলার কাজ ছিল)। তাঁর ক্ষোভের মূল কারণ ছিল যে, সিপিএফ প্রকল্পের প্রস্তাবটি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর পর প্রায় ছয় বছর পেরিয়ে গেলেও সেখান থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। এই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (JS) সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ার সময়, আইআইএমকে-এর অধিকর্তা তাঁর কাছে বিষয়টি তোলেন এবং প্রক্রিয়াটি দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ জানান। তিনি এটা জেনে আশ্চর্য হয়ে যান যে, প্রকল্পটির অনুমোদনের জন্য পাঠানো প্রস্তাবটিতে একটি গুরুতর ভুল ছিল। প্রস্তাবটিতে নিয়োগকর্তার প্রতি মাসে দেয় টাকার হার ১২% উল্লেখ করা হয়েছিল (যা ইপিএফ স্কিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), যেখানে সিপিএফ প্রকল্পে ১০% হারই অনুমোদিত ছিল। এই মারাত্মক ভুলটির কথা জেনে গভীরভাবে হতাশ হয়ে ফিরে আসার পর, তিনি CAO-কে নির্দেশ দিলেন যেন স্কিমটির মূল নথিপত্র মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়তে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি এটা জেনে বিস্মিত হলেন যে, এই বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়তে পাঠানো চিঠি এবং আনুষঙ্গিক নথিপত্রগুলো আইআইএমকে-এর প্রশাসন খুঁজে বের করতে পারছে না। এরপর তিনি প্রকল্পটির নির্ধারিত ছকের (format) একটি অনুলিপি সংগ্রহের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চাইলেন; সেই ছকটি যথাযথভাবে পূরণ করে তিনি মন্ত্রণালয়টিতে একটি নতুন প্রস্তাব পাঠালেন। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, তাদের সমন্বিত অর্থ বিভাগ (Integrated Finance Division), অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কর্মীবর্গ দপ্তরে (Department of Personnel) বহুবার ছোটোছুটি করার পর, অবশেষে দুই বছরেরও বেশি সময়ের পরে, তিনি সিপিএফ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক বিস্তৃতি জারি করাতে পারলেন। যদিও এই ২০০৭ সালে প্রকাশিত বিস্তৃতিটি কার্যকর হতে প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছিল, তবুও একই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সিপিএফ প্রকল্পের জারির তুলনায় এটি ছিল অনেক দ্রুততর একটি প্রক্রিয়া। এই সাফল্য কর্মচারীদের মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দিয়েছিল।

Problem in Staff Promotion কর্মীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত সমস্যা

কর্মীদের পদোন্নতির বিষয়টি মোটেও সহজ কাজ ছিল না। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কোনো কর্মীর পদোন্নতির অনুমতি দিতে আগ্রহী ছিল না, যদি না তিনি নির্দিষ্ট বেতন-স্কেলে ১২ বছরের

চাকরি পূর্ণ করে থাকেন। এ নিয়ে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছিল। যদি পিজিপি (PGP) প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো যেত, তবে অনুমোদিত কর্মী সংখ্যাও হয়ত বাড়ানো সম্ভব হতো এবং এর ফলে অ-শিক্ষক কর্মীরা পরবর্তী পদে পদোন্নতি লাভ করতে পারতেন। তবে পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়ানো সহজসাধ্য ছিল না। ঠিক তার আগের বছরেই, অর্থাৎ ২০০৩ সালে, ভর্তির সংখ্যা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ১২০ করা হয়েছিল। এর জন্য অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস এবং শিক্ষক-সহ নানাবিধ উপকরণের বা কাঠামোর প্রয়োজন হয়েছিল। নির্মাণাধীন একটি অনুরূপ শ্রেণিকক্ষ কমপ্লেক্সের নকশায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে শ্রেণিকক্ষ সংক্রান্ত সমস্যাটির কিছুটা সুরাহা করা গিয়েছিল। ৬০ আসনবিশিষ্ট দুটি শ্রেণিকক্ষকে ৭৯ আসনবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষে এবং ৩৬ আসনবিশিষ্ট দুটি শ্রেণিকক্ষকে ৬০ আসনবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষে রূপান্তরিত করার ফলে, ৬০ আসনবিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বেড়ে ৬-টিতে দাঁড়ায়; যেখানে মূল নকশায় এই সংখ্যা চার হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। অধিকর্তা বলেন, “আমার এই ভাবনাটি এসেছিল যে, আমরা যদি নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে পারি এবং কিছু অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারি, তাহলে পিজিপি-র ব্যাচের আকার বা শিক্ষার্থী সংখ্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে; ঠিক যেমনটি আমরা মাত্র এক বছর আগেই, ২০০২ সালের ৬০ থেকে বাড়িয়ে ২০০৩ সালে ১২০-এ উন্নীত করার মাধ্যমে করে দেখিয়েছিলাম।”

একদিন সিএও (CAO) এমন কিছু ছাত্রাবাসের জন্য (যেগুলোর নির্মাণকাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল এবং সেগুলোতে ১২০ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচকে আবাসন দেওয়া সম্ভব ছিল) নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তহবিলের তীব্র সংকটে থাকায়, আইআইএমকে-এর অধিকর্তা সরাসরি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। “নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়ার জন্য সিএও যখন বারবার জোর দিতে লাগলেন, তখন আমি জানতে চাইলাম যে ঠিক কতজন অতিরিক্ত প্রহরীর প্রয়োজন। আমি এটা জেনে অবাক হলাম যে, তিনি কোনো কোনো ছাত্রাবাসের জন্য একজন এবং অন্যগুলোর জন্য দুজন প্রহরী চেয়েছিলেন। আমি জানতে চাইলাম ছাত্রাবাসগুলোর আকার কি আলাদা? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কারণ যে জমিতে সেগুলো নির্মিত হয়েছে, তার গঠনপ্রকৃতিই এমন। ওই সাতটি ছাত্রাবাসের কক্ষসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে আমি লক্ষ্য করলাম যে, যদিও কক্ষের সংখ্যা ৪৪ থেকে ৫৪-এর মধ্যে ওঠানামা করছিল, তবুও প্রতিটি ছাত্রাবাসেই ৪০টিরও বেশি কক্ষ ছিল; যার অর্থ দাঁড়ায়, সব মিলিয়ে সেখানে ২৮০টিরও বেশি কক্ষ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মোট কক্ষসংখ্যা ছিল ৩১৮টি। আমি বেশ খুশীমনেই বিস্মিত হলাম এই দেখে যে, যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণকাজটি পিজিপি কোর্সে ভর্তি হওয়া ১২০ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচের (২টি সেকশন) কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল, তবুও পাহাড়ি জমির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন নকশায় নির্মিত হওয়ায় সেখানে ৬০টিরও বেশি অতিরিক্ত কক্ষ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমার মাথায় এই চিন্তা এল যে, আমরা যদি আরও কয়েকজন শিক্ষক (Faculty) নিয়োগ দিতে পারি, তবে ২০০৫ সালের জুন মাস নাগাদ শিক্ষার্থীর ব্যাচের আকার বাড়িয়ে ১৮০ জন করা সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে আরও একটি ৬০-আসনবিশিষ্ট ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হবে, যা এক বছরের মধ্যেই (অর্থাৎ, ২০০৬ সালের জুন মাসের মধ্যে) তৈরি করা সম্ভব; ঠিক সেই সময়েই ১৮০ জন শিক্ষার্থীর ওই ব্যাচটি তাদের দ্বিতীয় বর্ষে যাবে।”

“অধিকর্তা একজন অতিরিক্ত নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগে অনুমোদন দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি এই বিষয়টি প্রকাশ করেননি যে, এমনকি ২০০৫ সালের জুন মাসেও যদি ব্যাচের আকার বাড়িয়ে ১৮০ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো, তবুও তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রাবাসের সংকট দেখা দিত না,” তিনি বললেন। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, যখন শ্রেণিকক্ষগুলোর আকার পরিবর্তনের কাজ প্রায় শেষ

পর্যায়ে ছিল, তখন অধিকর্তা স্থপতিকে একটি বহুমুখী ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে, যখন স্থপতি প্রাথমিক নকশা ও ব্যয়ের বরাদ্দ জমা দিলেন, তখন অধিকর্তা সেটিকে বোর্ডের ‘নীতিগত’ অনুমোদনের জন্য পেশ করলেন। ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশি কেন, এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলো।

Excerpts of the explanation given by the Director to the Board:
বোর্ডের কাছে আইআইএমকে-এর অধিকর্তার ব্যাখ্যার নির্বাচিত অংশ:

“আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য একটি সাশ্রয়ী আবাসন অত্যন্ত জরুরি। আইআইএমকে-তে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উন্নয়ন কর্মসূচির (FDP) জন্য, কোনো নিয়মিত থাকার জায়গা নেই। অধিকন্তু, দ্বিতীয় ধাপের নির্মাণকাজটি কেবল ১২০ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচের ধারণক্ষমতা মাথায় রেখে নকশা করা হয়েছে। আইআইএমকে যদি ১৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আরও দুটি ছাত্রাবাসের প্রয়োজন হবে; যার মধ্যে একটি অবিলম্বে নির্মাণ করা আবশ্যিক। প্রস্তাবিত এই ছাত্রাবাসটি হবে একটি ‘বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য ভবন’ (multi-utility building) নির্মাণের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। বর্তমানে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পিজিপি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ছাত্রাবাসগুলো বছরে মাত্র ৯ মাস এবং একক-ব্যক্তি আবাসন (single occupancy) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নতুন ছাত্রাবাসটি বছরে ১২ মাস ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৯ মাস পিজিপি শিক্ষার্থীদের জন্য এবং বাকি ৩ মাস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (বিশেষত FDP, সিমুলেশন ইত্যাদি) পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হবে। দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই শহরের গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া ততটা তীব্র বা কঠোর নয়। এই ছাত্রাবাসটির নির্মাণ ব্যয় ২৫% বেশি হলেও, এর ব্যবহারিক উপযোগিতা বা কার্যকারিতা ৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।”

বোর্ড এই অভিনব প্রস্তাবের খুব প্রশংসা করেছে (বহুমুখী ছাত্রাবাসের অর্থনৈতিক উপযোগিতা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ‘ISB’ কেস স্টাডিটি দেখুন)।

Solving the Faculty Problem
অধ্যাপক সংকট নিরসন

প্রায় সমস্ত ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সংকট একটি গুরুতর সমস্যা। ২০০৫ সালের মার্চ মাসে, যখন অধিকর্তা ‘ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল’-কে PGP (স্নাতকোত্তর কর্মসূচি)-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১২০ থেকে বাড়িয়ে ১৮০ করার প্রস্তাব পেশ করেন, তখন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন; বিশেষ করে এই কারণে যে, মাত্র ২০০৩ সালের জুলাই মাসেই পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ১২০ করা হয়েছিল, যেখানে সেই অনুপাতে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। পূর্ণকালীন (full-time faculty) অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মোট সংখ্যা মাত্র ১৮ থেকে বেড়ে ২৩ হয়েছিল। ২০০৪ সালের অক্টোবর নাগাদ পিজিপি-এর চেয়ারম্যানের দেওয়া একটি উপস্থাপনায় বলা হয়েছিল যে, তৃতীয় একটি বিভাগ চালু করার জন্য ৪০ জন অধ্যাপকের দরকার। অনুমোদিত অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ২৭, কিন্তু বাস্তবে ছিলেন মাত্র ২৩ জন। ১৭ জন অধ্যাপকের এই ঘাটতি পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। অধিকর্তা যুক্তি দেখালেন, “এখন আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ৬০ জন শিক্ষার্থীর একটি নতুন বিভাগ যুক্ত করার জন্য, প্রথম বর্ষে মাত্র ৬ জন অতিরিক্ত অধ্যাপক দরকার হবে।

আমরা যদি এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ৬-৭ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা নিয়োগ দিতে পারি, তবে এখানে উপস্থিত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।” ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল এই প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে তাঁরা জোরালোভাবে এই শর্ত আরোপ করেন যে যতক্ষণ না ৬-৭ জন নতুন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা কাজে যোগদান করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে না। অধিকর্তা এই শর্ত মনে নিলেন।

উপরের আলোচনা অনুসারে, আইআইএমকে-এর অধিকর্তা ১২ জন অতিরিক্ত শিক্ষক এবং ১৩ জন অতিরিক্ত অ-শিক্ষক কর্মীর অনুমোদনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দ্বারস্থ হন। তিনি তাঁর আবেদনে অ-শিক্ষক কর্মীদের পদোন্নতির দাবির পাশাপাশি, শিক্ষার্থীর ভর্তির সংখ্যা ১২০ থেকে বাড়িয়ে ১৮০ করার জন্য আরও বেশ কিছু জরুরি বিষয় জানিয়েছিলেন।

প্রথমত, সেখানে মাত্র ৪টি অধ্যাপক পদ (২৭-২৩) খালি ছিল। একবার এই পদগুলো পূরণ হয়ে গেলে, উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলেও নতুন করে কোনো অধ্যাপক নিয়োগের আর কোনো সুযোগ থাকত না। দ্বিতীয়ত, বর্তমান অধ্যাপকদের পদোন্নতি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। এর ফলে বর্তমান অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়া থেকে আটকানো কঠিন হয়ে দাঁড়াত। তৃতীয়ত, আইআইএমকে-এর অধিকর্তা জানতেন যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় একটি 'ব্লক গ্রান্ট' প্রকল্প চালু করার বিষয় বিবেচনা করছে। এর অর্থ হলো, আগামী ৫ বছর ধরে প্রতি বছর মন্ত্রণালয়টি থেকে আইআইএমকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবে, যা দিয়ে তার নিয়মিত খরচ চালানো যাবে। এর উপর নিয়মিত ব্যয় মেটানোর জন্য মন্ত্রণালয়টি থেকে আর কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। এই ব্লক গ্রান্টের পরিমাণ নির্ধারিত হবে পিজিপি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে। এ ছাড়া, আইআইএমকে যদি ব্লক গ্রান্ট এবং অন্যান্য আয়ের (ফি ইত্যাদি) মোট অর্থ থেকে সমস্ত নিয়মিত ব্যয় মেটানোর পর কিছু অর্থ সাশ্রয় করে এবং তা একটি 'কর্পাস ফান্ডে' (মূলধন তহবিলে) জমা করে, তবে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সমপরিমাণ অর্থ 'ম্যাচিং গ্রান্ট' দেবে। এই অর্থও কর্পাস ফান্ডের সাথে যুক্ত করা যাবে, যতক্ষণ না এই ফান্ডের মোট পরিমাণ ৫০ কোটিতে পৌঁছায়।

যদি ব্যয় কমানো যায়, এবং পিজিপি ভর্তির সংখ্যা থেকে ফি বাড়ে, ব্লক অনুদান এবং ম্যাচিং অনুদান, এই সব উৎস থেকে আইআইএমকে-এর আয় বাড়বে। এতে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং ঠিকাদার ও অন্যান্য পাওনাদারদের বিল যথাসময়ে মেটানোর জন্য MHRD-এ মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং অনুদান ছাড়ের ওপর নির্ভর করে বসে থাকার প্রয়োজন হবে না। এখানে বলা ভাল যে দ্বিতীয় ধাপের ভবন নির্মাণকাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার স্বার্থে এই বিল পরিশোধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ ভাবে যখন এই কাজটি একটি স্বনামধন্য, কিন্তু বর্তমানে লোকসানে চলা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান করছে (এই বিষয়ে 'ISB কেস' পড়ে দেখুন)।

সবশেষে, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তীব্র ঘাটতির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তাঁদের কাজের চাপ (workload) বিশ্লেষণ করার সময়, একটি ভয়াবহ সত্য আইআইএমকে-এর অধিকর্তার নজরে এল। তিনি আইআইএমকে-এর 'প্রতি শিক্ষার্থীর খরচ' হিসাব করার সময় দেখলেন যে আইআইএমকে-এর মোট আনুষঙ্গিক ব্যয়ের (overhead expenses) ৬০ শতাংশ পিজিপি কর্মসূচির খাতে দেখানো হচ্ছিল। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় আইআইএমকে-এর ফি বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে এই হিসাবটিই ব্যবহার করেছিল, যার ফলে ইনস্টিটিউটটি প্রতি

শিক্ষার্থীর খরচের ৫০ শতাংশ অর্থ পুনরুদ্ধার করার সুযোগ পায়। এই হিসাবটি মূলত একটি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছিল—আর তা হলো, অধ্যাপকেরা তাঁদের মোট সময়ের গড়পড়তা ৫০ শতাংশ ব্যয় করেন পিজিপি কোর্সের পাঠদানে (যেখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি ৩০টি ক্লাস নিলে একটি 'ক্রেডিট লোড' গণ্য করা হতো) এবং বাকি অর্ধেক 'ক্রেডিট লোড' ব্যয় করেন পিজিপি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমে। সুতরাং, বছরে শিক্ষকদের মোট ৬টি কোর্সের কাজের চাপের (workload) মধ্যে ৩.৫টি কোর্স বা ৬০ শতাংশ কাজই পিজিপি-সম্পর্কিত কাজের জন্য নির্ধারিত ছিল; আর ঠিক এই কারণেই প্রতি পিজিপি শিক্ষার্থীর খরচের হিসাবে মোট আনুষঙ্গিক ব্যয়ের ৬০ শতাংশ অংশ বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছিল। যদিও এই হিসাবের ভিত্তিতে আইআইএমকে-তে ২৭ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা থাকার অনুমোদন ছিল, কিন্তু বাস্তবে সেখানে মাত্র ২৩ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন; ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের ওপর কাজের অত্যধিক চাপ ছিল।

তবে, পূর্ণকালীন শিক্ষকদের কোর্সের ক্রেডিট-ভার ৩.৫-এর পরিবর্তে মাত্র ১.৬ ছিল। খণ্ডকালীন শিক্ষকরা (Adjunct faculty) শিক্ষাদানের প্রায় ৫৫% ভার বহন করছিলেন, আর মূল বা পূর্ণকালীন শিক্ষকরা বহন করছিলেন মাত্র ৪৫%। যদি পিজিপি-এর ব্যয় গণনায় এই বিষয়টি প্রতিফলিত হতো, তবে এই কোর্সের উপরে চাপানো আনুষঙ্গিক ব্যয় (overheads) ৬০% (৩.৫/৬)-এর পরিবর্তে মাত্র ২৫% (১.৬/৬) হতে পারত; সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী-প্রতি ব্যয় ০.২৮ লাখ টাকা টাকা থেকে কমে ০.২১ লাখ টাকায় নেমে আসত। আর আইআইএমকে পিজিপি-এর ফি ০.১০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রায় ০.১৫ লাখ টাকা করার দাবি জানানোর পরিবর্তে, তা ০.১০৫ হাজার টাকার কাছাকাছি রাখার মাধ্যমেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হতো (অর্থাৎ, কার্যত ফি বাড়ানোর কোনো সুক্তি থাকত না)।

২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে আইআইএমকে তার অস্থায়ী প্রাপ্তি থেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ও ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক; কারণ সেই সময়ে আইআইএমকে-এর বিদ্যুৎ, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও বাগান সংক্রান্ত খরচগুলো প্রচন্ড হারে বেড়ে যাচ্ছিল। উদাহরণ, ২০০২-০৩ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিল যেখানে ছিল প্রায় ১০ লাখ টাকা, তা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বেড়ে ৮০ লাখ টাকারও বেশি হয়ে দাঁড়ায়। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মধ্যে এই খরচগুলো বেড়ে ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকারও বেশি হয়ে যায়, ছিল ২০০৩-০৪ অর্থবছরে সংগৃহীত মোট পিজিপি ফি-এর সমপরিমাণ। এই খরচগুলোর অধিকাংশই ছিল স্থায়ী বা নির্দিষ্ট ব্যয় fixed costs); তাই ফি বৃদ্ধি এবং সেই সাথে পিজিপি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা না বাড়ালে এই খরচগুলো মেটানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং, আইআইএমকে পরিচালনার সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোটি মূলত পিজিপি প্রোগ্রামে ভর্তি করা শিক্ষার্থীর সংখ্যার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

The Great Let Down & Exodus

মহানিরাশা ও গণ পদত্যাগ

৭ জন নতুন অধ্যাপকের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে (সাফাৎকারের সময় তাঁদের রাজি হওয়া শর্তাবলির ভিত্তিতে), অধিকর্তা যখন শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করলেন এবং অতিরিক্ত শিক্ষক ও অ-শিক্ষক পদগুলো অনুমোদনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কাছে জোরদার আবেদন জানালেন, ঠিক সেই মুহূর্তে দুটি ঘটনা ঘটল। প্রথমটি ছিল এক বিরাট হতাশা – আইআইএমকে-তে অধ্যাপনা করার নিয়োগপত্র নেওয়া সত্ত্বেও, নানা অজুহাত দেখিয়ে ৭ জনের

কেউই শেষ পর্যন্ত কাজে যোগ দিলেন না। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ৬ জন অধ্যাপক পদত্যাগ করলেন; দেশের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁদের নিয়োগ দিয়েছিল।

অধিকর্তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো অদম্য শক্তি ও সহনশীলতা আইআইএমকে-এর রয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে, মূল অধ্যাপকদের সুপ্ত কর্মদক্ষতাকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তবে অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষ হওয়ার ঠিক আগে, ১লা জুন, এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল; আর ৫ই জুন আইআইএমকে ছুটির পরে খুলেছিল। অনেক অধ্যাপকই শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁদের আপত্তি ও সংশয় জানিয়েছিলেন; কারণ একদিকে যেমন নতুন অধ্যাপকেরা কাজে যোগ দেননি, তেমনি অন্যদিকে ৬ জন অধ্যাপক তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন।

শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি আগামী বছরের জন্য স্বগিত রাখারও একটি প্রস্তাব ছিল। অধিকর্তা এ ব্যাপারে খোলামনে আলোচনা করেছিলেন; তবে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে অতিরিক্ত অধ্যাপক পদের অনুমোদন তিনি কেবল এই শর্তেই আদায় করতে পেরেছেন যে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির (intake) জন্যই এই পদগুলো অপরিহার্য এবং এই বৃদ্ধি ছাড়া পিজিপি (PGP) কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হতো না। মন্ত্রণালয়টি সম্ভবত এই কারণেই এতে সম্মত হয়েছিল যে, ছয়টি আইআইএম (IIM)-এর মধ্যে এটিই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা প্রতিষ্ঠার অষ্টম বছরেই পিজিপি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১৮০-তে বাড়াতে যাচ্ছিল; অথচ এই লক্ষ্য অর্জনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সময় লেগেছিল ১০ থেকে ২০ বছর।

অধিকর্তা আরও স্পষ্ট করেন যে, শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা যদি কার্যকর না করা হয়, তবে অনুমোদিত অধ্যাপক পদগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার সম্ভাবনাকেও তিনি উড়িয়ে দিতে পারেন না। যদিও ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করেছিল, তবুও অনেকেই যাঁরা এই ধারণার প্রতি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি না করার সুদূরপ্রসারী কুফলগুলো সম্পর্কে খুব একটা ধারণা ছিল না যে, যার মধ্যে কনিষ্ঠ সহকর্মীদের পদোন্নতির সুযোগ আটকে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুতর প্রতিকূলতায়ুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে (কেস ISBA ও B দেখুন) শিক্ষক ধরে রাখা এবং নতুন অধ্যাপক নিয়োগ করা আইআইএমকে-এর পক্ষে কতটা কঠিন, তা তাঁরা বুঝতে করতে পারেননি। অনেকেই কেবল নিজেদের কাজের চাপ ও ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই বিবেচনা করেছিলেন এবং অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আইআইএমকে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছিল, সে বিষয়ে তাঁরা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেননি। আইআইএমকে পরিচালনার অর্থনৈতিক দিকটি নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না; কিংবা সরকারের ওপর অত্যধিক নির্ভরতার কারণে ভবিষ্যতে যেসব সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়েও তাঁরা বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না।

অধিকর্তার এই বিশ্বাস অমূলক ছিল না। অধ্যাপক-মণ্ডলী আরও কাজের চাপ নিয়েছিলেন। এর পেছনে অবশ্য নতুন চালু করা 'উৎসাহ প্রদানকারী প্রকল্পেরও' ভূমিকা ছিল। শিক্ষকদের গড় পাঠদানের বোঝা (teaching load) আগের ১.৬ ক্রেডিট থেকে প্রায় ৩ ক্রেডিটে বেড়ে গিয়েছিল। বিপুল সংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ খণ্ডকালীন শিক্ষক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন শিল্প-ক্ষেত্রের

বিশেষজ্ঞ, স্বাধীন পরামর্শদাতা এবং ভারত ও বিদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে আসা শিক্ষাবিদ। এঁরা জানিয়েছিলেন যে, কাজের চাপ বাড়ার ফলে শিক্ষার মানের উপর কোনোরকম নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং চাকরির সংস্থান বা 'জব প্লেসমেন্ট'-এর ফলাফলেই এর প্রতিফলন ঘটেছিল। শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা দ্রুতগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, আইআইএমকে-এর চাকরির সংস্থান সংক্রান্ত র‍্যাঙ্কিং একই ছিল (বস্তুত, তা সামান্য উন্নতই হয়েছিল)। ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে আইআইএমকে-এর 'কর্পাস ফান্ড' ৫০ কোটি টাকার (অর্থাৎ, ৫ বছর মেয়াদী 'ব্লক গ্রান্ট' বা অনুদান-কালের তৃতীয় বছরেই) মাইলফলক পার করে। তৃতীয় বছর শেষ হওয়ার আগেই এই তহবিলের পরিমাণ ৬৫ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায় এবং ২০০৮-০৯ সালের মধ্যে তা ৮৫ কোটিতে পৌঁছে যায়। আশা করা হয়েছিল যে, ৫ বছর মেয়াদী ব্লক গ্রান্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এই তহবিল ১০০ কোটি হয়ে যাবে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর কর্মসূচির ফি ১,৫০,০০০ টাকা এবং শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা ১৮০ জন (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ মিলিয়ে মোট ৩৬০ জন শিক্ষার্থী) নির্ধারিত হওয়ায়, পিজিপি ফি বাবদ আয় ২০০৩-০৪ সালের প্রায় ১৭.৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৪ কোটি টাকা হয়; যা আইআইএমকে-এর পরিচালনার সামগ্রিক আর্থিক সমীকরণকেই আমূল বদলে দিয়েছিল। এই বাড়তি আয় ইনস্টিটিউটের যাবতীয় পুনরাবৃত্ত ব্যয় (recurring expenditure) বহন করতে সহায়তা করেছিল। এর ফলে আইআইএমকে তার পাওয়া ৬.৮ কোটি টাকার সম্পূর্ণ অনুদানই সাশ্রয় করতে পেরেছিল। এর পাশাপাশি, পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সুবাদে আরও প্রায় ২ কোটি টাকার অতিরিক্ত আয় হয়েছিল। যদি পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা মাত্র ১২০ জন এবং ফি এক লাখ টাকা নির্ধারিত থাকত, তবে ফি বাবদ আয় হতো মাত্র ২৪ কোটি টাকা, যা আইআইএমকে-এর ৪৫ কোটি টাকার সামগ্রিক পরিচালনা ব্যয় চালানোর জন্য যথেষ্ট হতো না। তাছাড়া, সেক্ষেত্রে আইআইএমকে-এর 'ব্লক গ্রান্টের পরিমাণও সম্ভবত মাত্র ৪.৫ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ থাকত। এতে ৫ বছর মেয়াদী অনুদান-কালে আইআইএমকে প্রায় ১০ কোটি টাকার সমপরিমাণ 'ব্লক গ্রান্ট' থেকে বঞ্চিত হতো।

এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে 'কর্পাস ফান্ড'-এ প্রায় ১০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা সম্ভব হয় এবং এর বিপরীতে সমপরিমাণ ১০ কোটি টাকার একটি 'ম্যাচিং গ্রান্ট' বা অনুদান পাওয়া যায়। এই সঞ্চয়ের সুবাদে, আইআইএমকে মাত্র তৃতীয় বছরের মধ্যেই ৫০ কোটি টাকার একটি কর্পাস ফান্ড গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এই তহবিলের ওপর অর্জিত সুদে থেকে আইআইএমকে ৬৫ কোটি টাকার কর্পাস ফান্ড গড়ে তোলে, যদিও ৫০ কোটি টাকার মাইলফলক পৌঁছানোর পর ম্যাচিং গ্রান্ট পাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পিজিপি-এর বার্ষিক ফি বাড়িয়ে ০.২ কোটি টাকা করা হলে যে অতিরিক্ত ১৮ কোটি টাকা আয় হয়, তা এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ফি বৃদ্ধি করায় আইআইএমকে-ও ফি বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল।

Containing the SNTS Agitation

অ-শিক্ষক কর্মীদের আন্দোলন বাগে আনা

যদিও পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮০ করা হয়েছিল, তবুও অ-শিক্ষক কর্মী সংক্রান্ত সমস্যাটি থেকেই গিয়েছিল। এর কারণ হলো, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত অধ্যাপক নেওয়ার অনুমোদন দিলেও, অ-শিক্ষক পদের অনুমোদনের বিষয়টি তখনো জানায়নি। এই ঘটনায় অ-শিক্ষক কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা আইআইএমকে-এর অধিকর্তার

উপর আস্থা হারাতে শুরু করেন; কারণ এই বিষয়টি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠানো এবং সেখান থেকে অনুমোদন করাতে হতো। এটা পুরো পদ্ধতিকে খুব জটিল ও সময়সাপেক্ষ করে তুলেছিল।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন নির্ধারণের অসঙ্গতি দূর করা, পদবি পরিবর্তন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার পরে, দ্বিতীয় ধাপের নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করা এবং অতিরিক্ত অধ্যাপক পদের অনুমোদন ও ফলস্বরূপ পিজিপি-তে ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো, এইসব মধ্য দিয়ে অ-শিক্ষক কর্মীরা পরিবর্তন দেখলেও, তাঁদের নিজেদের পদোন্নতির স্বপ্নটি তখনো পূরণ হয় নি। তাঁরা অধিকর্তাকে ক্ষমা করার কোনো মেজাজেই ছিল না এবং ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। আর অধিকর্তা একটি বিরাট আন্দোলনের আশঙ্কা করছিলেন। এই অবস্থায় তিনি একটি সভার ডেকে বুলিয়ে বললেন যে, অ-শিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ বা পদোন্নতির অনুমোদনের জন্য কেবল ইনস্টিটিউটের নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ছাড়পত্রই যথেষ্ট নয়। এছাড়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনও নিতে হবে। আর এই প্রক্রিয়াটি শেষ করতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। এই কথা শুনে কর্মীরা আরও বেশি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। অধিকর্তা তাঁদের বোঝালেন যে, এই বিষয়গুলো তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে; তবে এক্তিয়ারে যা কিছু সম্ভব, তা করতে তিনি বিন্দুমাত্র পেছপা হবেন না। অ-শিক্ষক কর্মীরা অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা যে একটি পদোন্নতি পরিকল্পনা (promotion scheme) জমা দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে এখনও কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। অধিকর্তা তখন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদগুলোই যদি শূন্য না থাকে, তাহলে ঠিক কী করা যাবে? এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে, যদি তাঁদের পদোন্নতি হয়ও, তবে তার ফলে তাঁরা ঠিক কী সুবিধা পেতে চায়। তাঁরা তখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর একটি তালিকা পেশ করল:

১. তাঁদের চাকরিতে পরিবর্তন (অনেকেই অনেক বছর ধরে একই পদে কর্মরত ছিলেন এবং তাঁরা চাকরিতে পরিবর্তন চান)।
২. তাঁদের পদমর্যাদায় পরিবর্তন।
৩. পারিশ্রমিক বৃদ্ধি।
৪. অবসরকালীন সুবিধাদি বৃদ্ধি।

অধিকর্তা কথা দিলেন যে তিনি ১, ২ এবং ৩ নম্বর বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন এবং সেগুলোর সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এর অংশ হিসেবে, তিনি একজন অ-শিক্ষক কর্মী ছাড়া, যিনি মাত্র গত বছরেই বদলি হয়ে এসেছিলেন, বাকি সব কর্মীর মধ্যে ‘জব রোটেশন’ বা কাজের পালাবদল প্রক্রিয়া চালু করলেন।

২০০৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে সব অ-শিক্ষক কর্মীর তাঁদের নতুন পদে দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল। কারো কারো এ বিষয়ে আপত্তি ছিল। কিন্তু অধিকর্তা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন – হয় সবাই, নতুবা কেউই নয়। অবশেষে, সব কর্মীরাই রাজি হলেন এবং একজন ছাড়া বাকি সব কর্মীই তাঁদের নতুন পদের দায়িত্ব নিলেন।

এই সিদ্ধান্তের ফলে অধিকর্তা সঠিক কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারলেন। যেমন, পিজিপি (PGP) অফিসে কর্মরত তৎকালীন সহকারী, পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বেড়ে ১৮০ জন হওয়ার ফলে, অফিসটাতে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো আনার বাড়তি চ্যালেঞ্জগুলো নিতে

সক্ষম ছিলেন না। তাঁর জায়গায় ভর্তি এবং আইডিএল (IDL) অফিসেও একজন দক্ষ অ-শিক্ষক কর্মীর প্রয়োজন ছিল।

এছাড়া, আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলো যেহেতু দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছিল, তাই সেগুলোর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আমরা একজন দক্ষ কর্মীকে চেয়েছিলাম। এর মাধ্যমে এই বার্তাও দেওয়া হয়েছিল যে, গুরুত্বহীন পদ এড়াতে হলে নিজেকে অবশ্যই যোগ্য প্রমাণ করতে হবে। সব শেষে, প্রতিটি বিভাগের সহকারীর জন্য আমাদের জরুরি ভিত্তিতে একজন বিকল্প বা ‘ব্যাক-আপ’ কর্মীর দরকার ছিল; কারণ প্রতিটি বিভাগেই মাত্র একজন করে নিয়মিত কর্মী ছিলেন, তাও আবার সহকারী পর্যায়ের। অ-শিক্ষক কর্মীদের মধ্যে মাত্র ১০ জন ছিলেন কর্মকর্তা বা অফিসার পর্যায়ের ছিলেন, যাদের মধ্যে ৪ জন হিসাব বিভাগে, ২ জন কম্পিউটার কেন্দ্রে, ১ জন করে গ্রন্থাগার ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিভাগে, ১ জন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে এবং ১ জন পরিচালকের ব্যক্তিগত সচিব হয়ে কর্মরত ছিলেন।

Introduction of the “Award Scheme”

“পুর্নস্কার প্রকল্প” চালু করা

তৃতীয় দাবিটি সম্পর্কে পরিচালক ভেবে দেখছিলেন এই বিষয়ে কী করা যায়। তিনি হিসাব কষে দেখলেন যে, পদোন্নতির ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা তাঁদের বেতন স্কেল অনুযায়ী একটি ইনক্রিমেন্ট পাবেন এবং এরপর নতুন স্কেলে তাদের পরবর্তী বাড়তি বেতন ধার্য করা হবে। এর পাশাপাশি, তাঁরা মহার্ঘ ভাতার (Dearness Allowance) ক্ষেত্রেও আনুপাতিক বৃদ্ধি পাবেন। যেহেতু এই ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫০ টাকা, তাই তিনি ধারণা করলেন যে, প্রতি মাসে তাঁদের বাড়তি আয় হবে প্রায় ৩০০ টাকা, অর্থাৎ, বার্ষিক মাথাপিছু প্রায় ৩৬০০ টাকা। তিনি অ-শিক্ষক কর্মীদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে জানতে চাইলেন যে, এই প্রস্তাবটি তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য কি না; তাঁরা এতে সম্মতি জানালেন।

অধিকর্তা মনে মনে ভাবলেন, “যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা মাত্র ১৭ জন, তাই এই বাবদ আইআইএমকে-এর মাত্র প্রায় ৬০,০০০ টাকা খরচ হবে। এটি খুব কম ছিল বিশেষ করে যখন পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির কর্মসূচিতে মাত্র ৬০ জন বৃদ্ধি করার ফলেই অতিরিক্ত ফি বাবদ আইআইএমকে-এর প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হবে।

তবে, একটা জটিলতা থেকেই গিয়েছিল। বিষয়টি অনুমোদন হবে কি না, তা জানতে অধিকর্তা অনানুষ্ঠানিকভাবে এমএইচআরডি-এর (MHRD)-এর আইএফডি (IFD)-এর মতামত চেয়েছিলেন। তারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে, গত তিন বছরে কর্মীদের কাজের চাপ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তাদের অসামান্য কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ‘এককালীন পুর্নস্কার’ (Lump Sum Awards) দিতে কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে, এর মধ্যে যেন কোনোভাবেই ‘বিশেষ বেতন বৃদ্ধি’ বা ‘special increment’-এর কোনো আভাস না থাকে। এরপর অধিকর্তা সেই সকল কর্মীরা, যারা তাদের সাত বছরের চাকরিজীবন পূর্ণ করেছিলেন, তাদের মোট প্রকৃত পাওনার হিসাব কষে বের করলেন।

এরপর তিনি দুটি পুরস্কার ঘোষণা করলেন, একটি ৫,০০০ টাকার, যা যাঁরা ৪,০০০-৬,০০০ টাকার বেতনক্রমে কর্মরত ছিলেন, সেই কর্মীদের জন্য; এবং দ্বিতীয়টি ৬,০০০ টাকার, যা ৫,০০০-৮,০০০ টাকার বেতনক্রমে থাকা কর্মীদের জন্য ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছিল অতিরিক্ত প্রাপ্য টাকা এক করে, যা কর্মীরা পেতেন যদি তাঁদের পদোন্নতি হয়েছে, এমনটা ধরে নিয়ে বেতন বৃদ্ধি (increment) করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একজন কর্মী ৫,০০০-৮,০০০ টাকার বেতনক্রমে ছিলেন এবং তাঁর সম্ভাব্য পদোন্নতির ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণের হিসাব অনুযায়ী তিনি ৬,৫০০ টাকা পাওয়ার অধিকারী হতেন; কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে পেলেন মাত্র ৬,০০০ টাকা। একইভাবে, যে কর্মী ৫,৯০০ টাকা পাওয়ার যোগ্য হতেন, তিনিও এককালীন পুরস্কার হিসেবে ৬,০০০ টাকাই পেলেন। এক্ষেত্রে প্রথম জন ৫০০ টাকা কম পেলেন, আর দ্বিতীয় জন ১০০ টাকা বেশি পেলেন। সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটেছিল এমন এক কর্মীর ক্ষেত্রে, যিনি ৪,০০০-৬,০০০ টাকার বেতনক্রমে ছিলেন এবং হিসাব অনুযায়ী মাত্র ২,৯০০ টাকা পাওয়ার যোগ্য হচ্ছিলেন; অথচ তাঁকে, ঐ একই বেতনক্রমে থাকা অন্য তিনজন কর্মীর মতোই, ৫,০০০ টাকা দেওয়া হলো। এটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, এই পুরস্কারটি শুধুমাত্র ২০০৫ সালের জন্যই প্রযোজ্য এবং এটি কেবল সেইসব কর্মীদের জন্য নির্ধারিত, যাঁরা সংশ্লিষ্ট বেতনক্রমে ৭ বছরের চাকরি পূর্ণ করেছেন ও কর্মক্ষেত্রে ভালো পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনো শূন্যপদ না থাকায় তাঁদের পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে যদি শূন্যপদ সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের পদোন্নতি হয়, তবে তাঁরা আর এই পুরস্কারের অর্থ পাবেন না।

অ-শিক্ষক কর্মীদের সামনে এই পুরস্কার প্রকল্পের ঘোষণা করার সময় অধিকর্তা সম্ভাব্য সমস্যা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, ঠিক কোন ভিত্তির ওপর এই পুরস্কারগুলো দেওয়া হচ্ছে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের প্রাপ্য অর্থের হিসাব কষে রেখেছিলেন, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে সেই হিসাবকৃত অর্থের পরিমাণ প্রস্তাবিত পুরস্কারের মূল্যের চেয়েও বেশি ছিল। তবে তিনি যখন কর্মীদের কাছ থেকে এই অভিনব পরিকল্পনার জন্য প্রশংসিত হলেন, বিশেষ করে সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার বিষয়টি নিয়ে, তখন তিনি আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন। উল্লেখ্য, সেই ব্যক্তিকে ২৯০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল (যাঁকে তাঁর সততা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা হতো)। অথচ তাঁদের হিসাব অনুযায়ী তাঁরই সবচেয়ে কম টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল মূলত কর্মীদেরই ত্যাগের জন্য, কারণ বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধির (increment) ভিত্তিতে প্রাপ্য অর্থের হিসাব করা হলে তাঁদের অনেকেই হয়তো বর্তমান পুরস্কারের চেয়েও অতিরিক্ত টাকা পেতেন।

ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও ন্যায়বিচারের প্রতি কর্মীদের এই গভীর নিষ্ঠা দেখে অধিকর্তা খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ২০০৬ সালে এই পুরস্কার প্রকল্পটি কর্মকর্তাদের জন্যও চালু করা হয়; কারণ তারাও ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ সামলাতে গিয়ে নিজেদের সাধের বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করছিলেন, অথচ সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য আইআইএম-গুলোতেও উচ্চতর গ্রেড বা পদোন্নতির অনুমোদন না থাকায় তাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগই ছিল না। এই পদক্ষেপটি অধিকর্তার জন্য কিছুটা স্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়; কারণ এর ফলে কর্মীদের মাঝে কিছুটা হলেও শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে এবং তাঁরা অধিকর্তার উপর আরও বেশি আস্থা রাখতে শুরু করেন, যে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতির বিষয়টিও সুনিশ্চিত করবেন।

Towards a Growth Based Policy একটি বৃদ্ধি-ভিত্তিক নীতির অভিমুখে

১৭ জন কর্মীর মধ্যে ১৩ জনই যখন ৫০০০-৮০০০ টাকার বেতনক্রমে কর্মরত এবং তাঁদের সকলেই ৬৫০০-৯০০০ টাকার বেতনক্রম পাওয়ার আশা করছিলেন, আর এর পাশাপাশি ১০ জন কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই উচ্চতর গ্রেডে ছিলেন, অধিকর্তা বুঝতে পারলেন যে, ১৩ জন কর্মকর্তা ও ৪ জন সহকারীর পদের অনুমোদনের প্রত্যাশা করাটা হয়তো নিরর্থক হবে। তিনি নিজেও প্রাথমিকভাবে একই প্রস্তাবই পেশ করেছিলেন। তিনি মনে করলেন যে, যদি এই নতুন বেতনক্রমগুলো চালু করা না হয়, তবে ভবিষ্যতে এই অ-শিক্ষক কর্মী সংকট আরও তীব্র আকার নেবে। তাই, অতিরিক্ত অ-শিক্ষক পদের জন্য তিনি বর্তমান ২টি এবং নতুন ৫টি বেতনক্রমে নীচে দেওয়া পদগুলোর প্রস্তাব পেশ করলেন:

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮০০০ - ১০০০০ টাকা* ৬৫০০ - ৯০০০ টাকা ৫৫০০ - ৮৫০০ টাকা ৫০০০ - ৮০০০ টাকা* ৪৫০০ - ৭৫০০ টাকা ৪০০০ - ৬০০০ টাকা ৩০৫০ - ৪০৪০ টাকা

২টি পদ: প্রশাসনিক কর্মকর্তা (A.O.)

৪টি পদ: সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা (AAO)

২টি পদ: বরিস্ত সহকারী (Sr. Assistants)

০টি পদ: সহকারী (Assistants)

২টি পদ: কনিষ্ঠ গ্রন্থাগার সহকারী (Jr. Lib. Assistants)

০টি পদ: উচ্চ বিভাগীয় করণিক (UDC)

৪টি পদ: বহুমুখী সহকারী (Multiskilled Assistants)

এর ফলে ১৭ জনের মধ্যে ১২ জনের পদোন্নতির এবং ৬ জন নতুন কর্মী নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে এবং মোট ১৮ জন কর্মীকে খুশী করবে।

তিনি আরও মনে করেছিলেন যে, শীর্ষস্থরে দুটি নতুন পদ তৈরির ফলে ভবিষ্যতে ১৪ জন কর্মীর পদোন্নতির সুযোগ হতে পারে। অবশিষ্ট ৬ জন কর্মী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি পাবেন না। তবে যথাসময়ে, যখন নতুন পদ অনুমোদিত হবে, তখন তাঁরাও পদোন্নতি লাভ করবেন। কিন্তু এর মূল সুবিধাটি হবে এই যে, কর্মীদের মাত্র দুটি বেতন-স্কেলে গাদাগাদি করে রাখার যে বোকামিটি এতদিন চলে আসছিল, যার ফলে তাদের সর্বদা সামগ্রিক হতাশার সম্মুখীন হতে হতো, সেই সমস্যা আর থাকবে না। এর অর্থ এও দাঁড়ায় যে, দীর্ঘমেয়াদে প্রতি ৫ বছর অন্তর যদি এক বা দুটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়, তবে বর্তমানে কর্মরত সকল কর্মীই পর্যায়ক্রমিক ৫ বছরের ব্যবধানে পদোন্নতি পাবেন। এমন একটি সমাধান বের করা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ 'ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনেল'-কে রাজি করাতে বেশ কয়েকবার আলোচনা করতে হয়েছিল। ৭ নম্বর ক্রমিকের পদটি মঞ্জুর করার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; তবে বহু-দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগের বিষয়টি পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করে দেখার পক্ষে অধিকর্তার যুক্তিটি তারা মেনে নেন। ১ ও ২ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোতে তাঁরা অনুমোদন দিলেও, ৩ ও ৫ নম্বর ক্রমিকের পদগুলোতে অনুমোদন দেননি। সব মিলিয়ে তাঁরা মোট ১১টি পদের অনুমোদন দেন। এর ফলে ১০টি পদোন্নতির এবং ৩টি 'বহু-দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী-তথা-গাড়ি চালক' পদের পথ সহজ হয়। এই গাড়ি চালক-কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের জন্য এক বিশাল আশীর্বাদ ছিলেন, কারণ তাঁরা একইসাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করায় দক্ষ ছিলেন। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় ১০ মাস সময় লেগেছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত ২০০৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে কার্যকর হওয়া নতুন 'পৃষ্টি-ভিত্তিক পদোন্নতি নীতি'-তে অ-শিক্ষক কর্মীদের পদোন্নতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

২০০৮ সালে যখন পিজিপি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ২৬০ করা হলো, তখন মাত্র ২ মাসের মধ্যেই মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের (MHRD) নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলোর অনুমোদন পাওয়া যায়:

১০,০০০-১৪,৫০০ টাকা স্কেলের ২টি পদ; ৬,৫০০-৯,০০০ টাকা স্কেলের ২টি পদ; ৫,৫০০-৮,৫০০ টাকা স্কেলের ২টি পদ; এবং ৩,০৫০-৪,০৫০ টাকা স্কেলের ১টি পদ।

যেহেতু ৮,০০০-১০,৫০০ টাকা স্কেলের পদের জন্য কোনো যোগ্য প্রার্থী তখন ছিলেন না, এবং ১০,০০০-১৪,৫০০ টাকা স্কেল পর্যন্ত পদগুলো অভ্যন্তরীণভাবে পূরণ করার নিয়ম ছিল, তাই সাময়িকভাবে কিছু পদের স্কেল কমিয়ে দেওয়া হয়। পরে যখনই যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়, তখনই সেই পদগুলো পূরণ করে নেওয়া হয়।

২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় ধাপের পদোন্নতি নিশ্চিত করা হয়। এ সময় দুজন কর্মী কিছুটা অসন্তুষ্ট হন, কারণ তাঁরা ৬,৫০০-১০,৫০০ টাকার বেতন স্কেল পান নি (নির্বাচন কমিটি তাঁদের ওই পদের জন্য উপযুক্ত মনে করেনি)। তবে, তাঁরা ৫,৫০০-৮,৫০০ টাকার বেতন স্কেলে পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে, মাত্র তিন বছরের মধ্যে সব অ-শিক্ষক কর্মীর পদোন্নতি হয়েছিল, যা ছিল এক বিরল ঘটনা এবং এমন একটি বিষয় যা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানকে আর কখনোই 'একক বেতন স্কেল কর্মীদের জট' সমস্যায় ভুগতে হবে না। এই সমস্যাটি এতদিন অ-শিক্ষক কর্মীদের পেশাগত অগ্রগতিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাশাপাশি, পদোন্নতির ক্ষেত্রে 'মেধা'কে একটি নির্ণায়ক মানদণ্ড হিসেবেও ঠিক করা সম্ভব হয়েছে।

বেদনা ও পরম সুখের সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে অধিকর্তা বললেন: “আমি কখনোই কল্পনা করিনি যে, এতসব অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হবে। কিন্তু যে বিষয়গুলো পড়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেতাম যেমন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (Project Management) ও অনুপ্রেরণামূলক নীতি (Motivation Policies), সেগুলোর ক্ষেত্রে চিন্তাধারায় সামান্য কিছু উদ্ভাবনী পরিবর্তনই আমার এই সাফল্য এনে দিয়েছে আর শিক্ষক ও কর্মীদের

মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে অনেকগুলি অসাধারণ কৃতিত্ব লাভে সক্ষম করেছে।”

এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় নীচে দেওয়া হলো (সংযোজনী ২ দেখুন):

- ii) iii) iv) v) vi) vii) আইআইএমকে হলো দ্রুততম বেড়ে ওঠা আইআইএম - IIM:
- প্রতিষ্ঠার ১২তম বছরে পিজিপি ভর্তির সংখ্যা ২৬০-এ এবং ১৩ তম বছরে তা ৩০০-তে বাড়ানো, যা অর্জন করতে অনেক পুরোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ৪০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। এই ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পিজিপি শিক্ষার গুণমান বিন্দুমাত্র কমে যায় নি, যার প্রতিফলন পাশ হওয়া শিক্ষার্থীদের নিয়মিত চাকরি পাওয়া ও সামার প্লেসমেন্টের পরিসংখ্যানে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে।
- আইআইএমকে তার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই পিজিপি ভর্তির ক্ষেত্রে ওবিসিকোটার বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা পার করেছে; অথচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো তিন বছর পরিয়ে যাওয়ার পরেও এই একই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে।
- আইআইএমকে অধ্যাপকদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির (Faculty Development Programme) ক্ষেত্রে অগ্রণী স্থানে রয়েছে। এছাড়া, 'এক্সিকিউটিভ পিজিপি' কার্যক্রমটি অনলাইনে চালু করা প্রথম প্রতিষ্ঠান হয়েছে ও অনলাইন শিক্ষাক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
- 'ব্লক গ্রান্ট স্কিম'-এর তৃতীয় বছরেই ৫০ কোটি টাকার মাইলফলক ছুঁয়েছে; এবং তৃতীয় বছরেই 'ম্যাচিং গ্রান্ট' (matching grant) সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, পঞ্চম বছরের মধ্যে ১০০ কোটি টাকায় পৌঁছাবে মনে করা হচ্ছে।
- প্রায় প্রতিটি শিক্ষাগত কার্যক্রমে সবচেয়ে কম ফি নেওয়া সত্ত্বেও, আইআইএমকে পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত আয় করে, যা ২০১০ সালে সরকারের প্রস্তাবিত এক বা দুটি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে কাজে দেবে।
- আইআইএমকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গবেষণা সেমিনার ও সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে।

“আমার স্বপ্ন ছিল অ-শিক্ষক কর্মচারীদের সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করা। তা পূরণ হয়েছে। বস্তুত, ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে এমন একটি দিন এসেছিল, যেদিন আমি আইআইএমকে-এর অধিকর্তার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর এবং লখনউতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম; কারণ আমার স্ত্রী তখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁকে সেবা-যত্ন করার জন্য আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সৌভাগ্যবশত, পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তবুও, আমি দোটানায় ভুগছিলাম। তবে তাঁর উৎসাহ এবং ওবিসি (OBC) কোটা-সংক্রান্ত আসন বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আমার উদ্বেগ, যা একজন নতুন অধিকর্তার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অবকাঠামো ও শিক্ষক-সংকটের মতো গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারত এবং যার ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়ানোর মতো সাহসী সিদ্ধান্ত না নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই পরিপন্থী পরিস্থিতিগুলির মোকাবিলা করে আমি আইআইএমকে-তে আমার পূর্ণ পাঁচ বছরের মেয়াদ সাফল্যের সঙ্গে পুরো করতে পেরেছিলাম।”

২০০৮ সালে আমরা পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ২৬০-এ করতে পেরেছিলাম। ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মাত্র দুই মাসের মধ্যেই মানব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে (MHRD) থেকে অতিরিক্ত অধ্যাপক এবং অ-শিক্ষক পদের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। এই অনুমোদন সকল কর্মীর পদোন্নতি নিশ্চিত করেছিল। পিজিপি-তে ভর্তির সংখ্যা না বাড়লে, এই অনুমোদন পাওয়া যেত না। আর এই অনুমোদনই আমাকে আমার করা প্রতিশ্রুতি ও সংকল্প রাখতে সহায়তা করেছিল।

অধিকর্তা হিসাবে আমার স্বপ্ন পূরণ করে, আমি আমার মূল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে এলাম। কর্মকর্তাদের (officers) জন্য আমি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি। এর প্রধান কারণ ছিল, তাঁরা ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ বেতন-স্কেলে ছিলেন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MHRD) কোনো প্রতিষ্ঠানকেই নতুন করে উচ্চতর বেতন-স্কেল প্রদানের অনুমতি দিচ্ছিল না, কেবল সেই ক্ষেত্রগুলো ছাড়া, যেখানে বহু দশক আগেই অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। তবে আমি তাঁদের জন্যও একটি ‘পুরস্কার প্রকল্প’ (AWARD scheme) চালু করেছিলাম, যা অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ছিল না। IMP-এর মতো একটি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কাজের চাপ ও চাহিদার চাপ আমি আগে কখনো কল্পনাও করিনি; এমনকি এখানে যোগ দেওয়ার সময় আমার মনে হয়নি যে, আমি সেই গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারব। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এবং এখানকার সহকর্মীদের সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়া ক্রমশ গভীর হওয়ার সুবাদে, আমরা এমন কিছু অর্জন করতে পেরেছি হয়েছি, যাকে নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ কীর্তি বলা যায়।

“আমার উত্তরসূরিও সেই উদ্দীপনা বজায় রেখেছিলেন এবং সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে প্রায় একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন; তিনি পিজিপি-তে শিক্ষার্থী ভর্তির আসনসংখ্যা আরও বাড়িয়ে ৩০০-তে নিয়ে গিয়েছিলেন (যার ফলে, সরকার নির্ধারিত ৩ বছরের মধ্যে ভর্তির হার ৫৪% বৃদ্ধির শর্তটি তিনি কেবল পূরণই করেননি, বরং দ্বিতীয় বছরেই তা ১০% ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন)। এটা এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন অপেক্ষাকৃত কম সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য আইআইএম গুলোর পক্ষে এমন পদক্ষেপের কথা চিন্তাও করা কঠিন হয়ে পড়েছিল,” নিজের পাঁচ বছর মেয়াদী কার্যকাল সমাপ্তির আগে তাঁর অনুভূতি জানাতে গিয়ে কথাগুলো বললেন ‘IMP’-এর প্রাক্তন অধিকর্তা।

“২০০৪ সালে যখন আমি যোগ দিই, তখন নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগত, ‘ছোট জিনিস বা কাজ কি সুন্দর হয়?’ আজ আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, ‘ছোট জিনিস বা কাজ কি সুন্দর নয়?’” তিনি কৌতুকচ্ছলে বললেন।

Autonomy from the MHRD

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (MHRD) থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ

ধৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাকে কিছু মজাদার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যা বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল-ভিত্তিক সহায়তার বিষয়ে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়।

১. যখন অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ফি কমিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল, তখন আইএমপিকে ফি বৃদ্ধি করার অনুমতি পেয়েছিল।
২. যখন অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অ-শিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপক শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না, তখন আইআইএমকে তা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
৩. যখন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকেই প্রাথমিক পর্যায়ে এমন অনুমতি দেওয়া হয়নি, তখন আইআইএমকে একবারেই ২০০ শয্যাবিশিষ্ট এমডিপি (MDP) কমপ্লেক্স নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
৪. আইআইএমকে বার্ষিক ৬.৮ কোটি টাকার একটি ব্লক অনুদান পেয়েছিল, যেখানে সমসাময়িক অন্য একটি IIM-কে দেওয়া হয়েছিল ৪.৫ কোটি টাকা।
৫. ৩,০৫০-৪,০৫০ টাকার বেতন স্কেলে পদ সৃষ্টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল—যা সাম্প্রতিক অতীতে নীতিগতভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করেনি।
৬. ওবিসি কোটার আওতায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জমি কেনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, বিশেষত বৃষ্টির জল সংরক্ষণের (water harvesting) প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে; কারণ সেখানে জল সরবরাহের অন্য কোনো বিকল্প উৎস ছিল না।

আমি আইআইএমকে-তে যোগ দেওয়ার পর থেকেই, বিভিন্ন আইআইএম গুলোর সাথে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রায়শই নানা ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তবে অন্যরা যতটা তীব্রভাবে এই চাপ বা প্রতিকূলতা অনুভব করেছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে তা ততটা অনুভব করিনি। হতে পারে তাঁদের প্রেক্ষাপট এবং পারিপার্শ্বিক চাপগুলো ছিল ভিন্ন। তবে আমি মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বেশ নমনীয় ও সহযোগিতামূলক ভূমিকায় দেখেছি। অবশ্য, আমি সব সময় কয়েকটি মৌলিক নীতি মেনে চলেছি, যা আমি আমার নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (alma-mater) থেকেই শিখেছিলাম।

- ১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮. ৯. ১০.
সফল হতে হলে, একটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই তার সকল অংশীদারদের (stakeholders) স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি যখন সফল হয়ে ওঠে, তখন আমরা সাধারণত কেবল পূর্ণকালীন কর্মীদের স্বার্থ দেখার দিকেই বেশি নজর দিই। সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে মূলত একটি সুনির্দিষ্ট 'সনদ' বা 'চার্টার' এবং একগুচ্ছ শিক্ষাগত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কার্যক্রমগুলো কোনো একপেশে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে নয়, বরং অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিচালনা করা বা এগিয়ে নেওয়া আবশ্যিক। সমাজের বৃহত্তর ও বৈচিত্র্যময় অংশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি অর্জন করতে হবে এবং নিজের কার্যক্রমের পরিধি বা বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। এটা মূলত প্রতিষ্ঠানের মূল সনদেরই একটি অন্তর্নিহিত শর্ত।
- পরিষেবা দেওয়ার জন্য এমন মূল্য ধার্য করতে হবে, যা ব্যবহারকারীদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে, তার মধ্যেই একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় খরচ চালাতে হবে। ব্যবহারকারীদের দীর্ঘমেয়াদে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে, অর্থের বিনিময়ে তাঁদের যথাযথ সুফল দেওয়া নিশ্চিত করুন। উদ্ভাবনী পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে খরচ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং তা কমানোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ক্রমবর্ধমান খরচের সম্পূর্ণ বোঝা সরাসরি ব্যবহারকারীদের (এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের) উপর চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন

(কেননা এর ফলে শিক্ষার মতো সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন পরিষেবা পাওয়া থেকে সুবিধাবঞ্চিত ব্যবহারকারীরা বঞ্চিত বা শোষণের শিকার হতে পারেন)।

- খরচ কমিয়ে আনার অর্থ এই নয় যে পরিষেবার গুণমানও কমবে; বিশেষত যেখানে গুণমান বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। মনে রাখবেন, একটি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাবাদী আচরণ দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।
- সম্পদের অভাব কখনোই সীমাবদ্ধতা নয়। বিষয়টি নির্ভর করে আপনি সেটিকে কীভাবে দেখেন তার ওপর। সম্পদ চারপাশেই ছড়িয়ে থাকে, হয় একেবারে তৈরি অবস্থায়, নতুবা আধা-সমাপ্ত রূপে (যা হয়তো কিছুটা পরিমার্জন করে নিতে হবে)।
- স্বায়ত্তশাসন ভিক্ষা করে বা জোর করে আদায় করা যায় না; বরং বিভিন্ন অংশীদারদের কাছ থেকে তা অর্জন করে নিতে হয়।

উপরে দেওয়া বিশ্বাসগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমি সর্বদা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সনদের (Charter) ওপর মনোযোগ দিয়েছি, অর্থাৎ মূল অংশীদার ও সম্পদের সরবরাহকারী হিসাবে সরকারের উদ্বেগের গুরুত্ব দিয়েছি এবং স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা তৈরি করেছি।

আমি জোড়াতালি দেওয়া অবকাঠামোতে ইনপুট-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি মডেলকে আউটপুট-ভিত্তিক মডেলে রূপান্তরিত করেছি। এভাবে যে, কার্যক্রমগুলো যখন গতি পেলে ও একটি অর্থনৈতিক মাত্রায় পৌঁছাল, তখন একটি সাম্রয়ী এবং স্থিতিশীল অবকাঠামো তৈরি করলাম।

Questions

প্রশ্নাবলি

1. অ-শিক্ষক কর্মীদের অসন্তোষের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অধিকর্তা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, সেগুলোর তালিকা বানান।
2. তিনি কীভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছিলেন?
3. এই কাজটি করতে কি এত সময় লাগা উচিত ছিল?
4. অধিকর্তা কেন এক পর্যায়ে "ছোটই কি সুন্দর?" ভেবেছিলেন? কেনই বা পরে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন?